বাংলাদেশ
শান্তি ও নিরাপত্তা

CRi
www.cri.org.bd

বাংলাদেশ: শান্তি ও নিরাপত্তা

Centre for Research
and Information

সূচিপত্র

ভূমিকা

১. সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধ ৫

২. জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ৮

৩. জঙ্গিবাদের অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণ ৯

৪. জঙ্গিবাদ দমন ১১

৫. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ ১৪

৬. নিরাপত্তা সম্পর্কে জনগণের উপলব্ধি ১৫

ভূমিকা

জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা মোকাবেলায় বাংলাদেশের দায়বদ্ধতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশ দেশি-বিদেশি জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হলেও ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বাংলাদেশ আর সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল নয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য পাঠানো দেশগুলোর অন্যতম এখন বাংলাদেশ। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বৈশ্বিক উদ্যোগে নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। ভয়াবহ নির্যাতনের মুখে উদ্বাস্তু হয়ে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসা দশ লাখের অধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েও বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে।

দুনিয়াজুড়ে জাতীয় ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ দুটি কঠিনতম হুমকির মুখোমুখি। এই দুই হুমকির নাম জঙ্গিবাদ ও সহিংস চরমপন্থা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশও জঙ্গি ও সহিংস চরমপন্থীদের হুমকির মুখোমুখি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ববান ও সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব ও শূন্য সহনশীলতা নীতির উপর ভর করে জঙ্গি ও সহিংস চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, চরমপন্থীদের হুমকির মুখে থাকা মানুষদের মূলধারায় নিয়ে আসা ইত্যাদি নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কী কী উদ্যোগ নিয়েছে, এই কাজে বাংলাদেশের সাফল্য এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কী ভূমিকা পালন করছে তা এই প্রকাশনায় তুলে ধরা হয়েছে।

১ সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছাড়াও সুশীল সমাজ, এনজিও এবং গণমাধ্যমকে শামিল করে নিয়েছে সরকার। ঘৃণা ও চরমপন্থা উসকে দেওয়ার মতো প্রচার-প্রচারণার কার্যকর পাল্টা-ভাষ্য প্রচারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিপদ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করার জন্য সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সমাজকর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করছে সরকার।

জঙ্গিবাদ ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধ ও নির্মূল করতে বাংলাদেশ বিভিন্ন রকম সামাজিক, শিক্ষা এবং ধর্মীয় কর্মসূচি নিচ্ছে। ২০১০ সালে সরকার একটি চরমপন্থা বিরোধী দৃঢ় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষানীতির অন্যতম মূল প্রস্তাব মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সংস্কার।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকেও চরমপন্থা বিরোধী অধ্যায় যোগ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজে জঙ্গিবাদ বিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করে আসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সকল মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীই যেন উপযুক্ত শিক্ষা পায় এই উদ্দেশ্যে সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়াবলি নিয়ে একটি সমন্বিত জাতীয় পাঠ্যক্রম দাঁড় করাচ্ছে।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইমাম ও আলেমদের সাথে কাজ করছে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও নির্মূল বিষয়ক জাতীয় কমিটি। সরকার পরিচালিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের উদ্যোগে জঙ্গিবাদ ও সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ নানা বিষয়ে প্রায় ৭০,০০০ ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে দেশব্যাপী মসজিদে মসজিদে নিয়মিত জঙ্গিবাদ বিরোধী খুতবা পাঠ করা হচ্ছে।

সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে জঙ্গি প্রচারাভিযানের পাল্টা-ভাষ্য হিসেবে ধর্মগ্রন্থ ভিত্তিক জঙ্গিবাদ বিরোধী বার্তা প্রচারে ধর্মীয় নেতাদের সংযুক্ত করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পবিত্র কোরান যে জঙ্গি সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না সে কথা আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য ইমামদের যুক্ত করা হচ্ছে। পুলিশও সামাজিক নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। সাথে সাথে নিখোঁজ ছাত্রদের সনাক্ত করতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া ঠেকাতে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে একযোগে কাজ করছে পুলিশ। সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধ ও নির্মূল করতে গবেষণা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্যোগ নিচ্ছে দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানাদি, বিভিন্ন

বেসরকারি সংস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

২০১৪ সালে বাংলাদেশ সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে স্থানীয় তৃণমূল পর্যায়ে সহায়তা করার জন্য গঠিত সরকারি-বেসরকারি বৈশ্বিক তহবিল গ্লোবাল ফান্ড ফর কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড রেসিলিয়েন্সের (জিসিআরএফ) বোর্ড সদস্য ও পাইলট দেশ হয়েছে। এখন পর্যন্ত জিসিআরএফের অধীনে তিন জেলায় - সাতক্ষীরা, কক্সবাজার এবং চাপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশের সংগঠনগুলো জিসিআরএফের অধীনে কমিউনিটি সাপোর্ট মেকানিজমের (সিএসএম) মাধ্যমে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। জিসিআরএফ তহবিলের প্রধান প্রাপক হিসেবে তিনটি স্থানীয় সংগঠনের সাথে অনুদান-চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সিএসএম।

ধর্মের নামে সন্ত্রাস করে যারা ধর্মকে কলঙ্কিত করছে, ধর্ম ও বিশ্বাসের শক্তি কাজে লাগিয়েই তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দুটি বড় উদ্যোগ নিয়েছে। প্রথম উদ্যোগ হল বৃহৎ মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রকল্প এবং দ্বিতীয়টি হল দেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর একটি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্র-শিক্ষদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশব্যাপী মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকার ধর্ম বিষয়ে যেসব ভুল ধারণার কারণে জঙ্গিবাদ ও সহিংস চরমপন্থা ছড়ায় সেসবের পাল্টা-ভাষ্য হিসেবে প্রকৃত ইসলাম প্রচার করার জন্য দেশজুড়ে ৫৬০টি মডেল মসজিদ তৈরি করবে। ধর্মশিক্ষার জন্য মডেল মসজিদে গবেষণার ব্যবস্থা, সভাকক্ষ, পাঠাগার প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা থাকবে।

গত বছর কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে ইসলামিক স্টাডিজ বা আরবিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির

সমমানের স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। কওমি মাদ্রাসা বাংলাদেশের ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দুটি ধারার একটি, অন্যটি সরকার নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসা। দাওরায়ে হাদিসের স্বীকৃতির ফলে কওমি মাদ্রাসা থেকে পড়াশুনা সম্পন্নকারী ছাত্ররা প্রথমবারের মতো স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের জন্য সংরক্ষিত চাকরিতে আবেদন করার সুযোগ পাচ্ছে। ইতোমধ্যে এই স্বীকৃতি কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য সুফল বয়ে আনতে শুরু করেছে। ২০১৮ সালের ৫ মার্চ পর্যন্ত সর্বমোট ১,০১০ জন কওমি মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্র প্রথমবারের মতো সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদ-ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসার কওমি নেসাবের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা।

এই সিদ্ধান্ত কওমি শিক্ষাব্যবস্থাকে মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটা বড় পদক্ষেপ । বর্তমানে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা চলছে। এই আইনের খসড়া করার জন্য একটি বিশ্লেষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুসারে দেশে যে ছয়টি কওমি মাদ্রাসা বোর্ড রয়েছে তার প্রত্যেকটি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরীক্ষা বোর্ড গঠন করা হবে। তাদের প্রতিষ্ঠানের মূল ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়গুলো ছাড়াও প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদের উপযোগী ৬০টি পাঠ্যপুস্তক তৈরি করেছে কওমি মাদ্রাসাগুলো। এসব পাঠ্যপুস্তকের বিষয়াবলির মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ভূগোল, সামাজিক শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। সুতরাং, এই স্বীকৃতির কল্যাণে কওমি শিক্ষাব্যবস্থা এখন ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে সাধারণ শিক্ষার বিষয়কেও নিজেদের অংশ করে নিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

কওমি শিক্ষাব্যবস্থাকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য শেখ হাসিনার সরকারের এই উদ্যোগ কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে সহিংস চরমপন্থা ছড়িয়ে পড়া রোধ করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০১৫ সালের একটি গবেষণা মোতাবেক বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার, আর এসব মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। প্রতি বছর অনেক ছাত্র এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বের হচ্ছে। পাশ করার পর তাদের ভবিষ্যৎ এতদিন কেবল ধর্মবিষয়ক পড়াশোনা ও এই বিষয়ক চাকরিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সর্বোচ্চ ডিগ্রির স্বীকৃতি তাদেরকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করবে, সৃষ্টি করবে তাদের জন্য চাকরির সুযোগও। বিরাট সংখ্যক যুবকের মন থেকে দূর হবে বঞ্চনার অনুভূতি।

২ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই

বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় এবং সবচেয়ে সহিংস সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)। জেএমবির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যদিও অনেক রক্ত ঝরেছে, তবে বেশ কিছু বড় বড় অভিযান চালিয়ে এবং জঙ্গিদের বিচারের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করে জেএমবির নেটওয়ার্ক প্রায় গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এক বছরে সারা দেশে ২০টি বড় বড় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং এতে ৪১ জন নব্য জেএমবি সদস্য গ্রেফতার হয়েছে। এসব অভিযানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সশস্ত্র জঙ্গিদের সামনাসামনি লড়াই হয়েছে, বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছে ৫৭ জঙ্গি। আর জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ১১ জন বীর কর্মকর্তা।

গ্রেফতারকৃত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত দেশে বিদ্যমান সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে ৫০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমনকি ২০১৬ সালের পহেলা জুলাইয়ের জঙ্গি হামলার পর যে অভিযান চালানো হয়েছে তারও আগে জেএমবি ও অন্যান্য সংগঠনের ২০০ জঙ্গি সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল ১৩ সন্ত্রাসী। বিশ্লেষক এবং বিশেষজ্ঞদের মতে হোলি আর্টিজানের জঙ্গি হামলার পরে যে ব্যাপক এবং বিস্তৃত জঙ্গিদমন অভিযান চালানো হয়েছে তাতে সশস্ত্র জঙ্গিদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। কড়া গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনী যেভাবে অনবরত জঙ্গিদের অবস্থান খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলেছে এবং তাদের গতিবিধি সনাক্ত করে ফেলছে যার ফলে বড় আকারে হামলা চালানোর সাংগঠনিক সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে জঙ্গি দলগুলো।

৩ জঙ্গিবাদের অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণ

বাসেল ইনস্টিটিউট অব গভার্নেন্সের এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কাউন্টার টেররিস্ট ফিন্যান্সিং (এএমএল/সিটিএফ) সূচকে ২৮ ধাপ উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালের বাসেল এএমএল সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৮২তম স্থান অধিকার করেছে। আগেরবার বাংলাদেশের স্থান ছিল ৫৪তম। এএমএল/সিটিএফ নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতি, আর্থিক মান, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন সংক্রান্ত সর্বমোট ১৪টি উপসূচক একত্র করে এএমএল সূচকের জন্য একটি সার্বিক ঝুঁকির মান তৈরি করা হয়। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটি ০ থেকে ১০ পর্যন্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে ঝুঁকির মান তৈরি করে থাকে। এই মানদণ্ডে ০ থেকে ৩.৩ নিম্ন ঝুঁকি, ৩.৩ থেকে ৬.৬ মাঝারি ঝুঁকি এবং ৬.৬ থেকে ১০ উচ্চ ঝুঁকি নির্দেশ করে। গত বছরের ৬.৪০ থেকে নেমে এ বছর বাংলাদেশের ঝুঁকির মান দাঁড়িয়েছে ৫.৭৯। এই হিসেবে বাংলাদেশ ১০০টি মাঝারি ঝুঁকির দেশের মধ্যে পড়ে। ৫.৫৮ স্কোর নিয়ে ভারতও এই মাঝারি ঝুঁকির দেশের মধ্যেই আছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ৮৮তম অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে শুধু ভারত। পাকিস্তানের অবস্থান ৪৬তম, শ্রীলংকার ২৫তম, নেপালের ১৪তম, মায়ানমারের ১৩তম এবং আফগানিস্তানের ২য়।

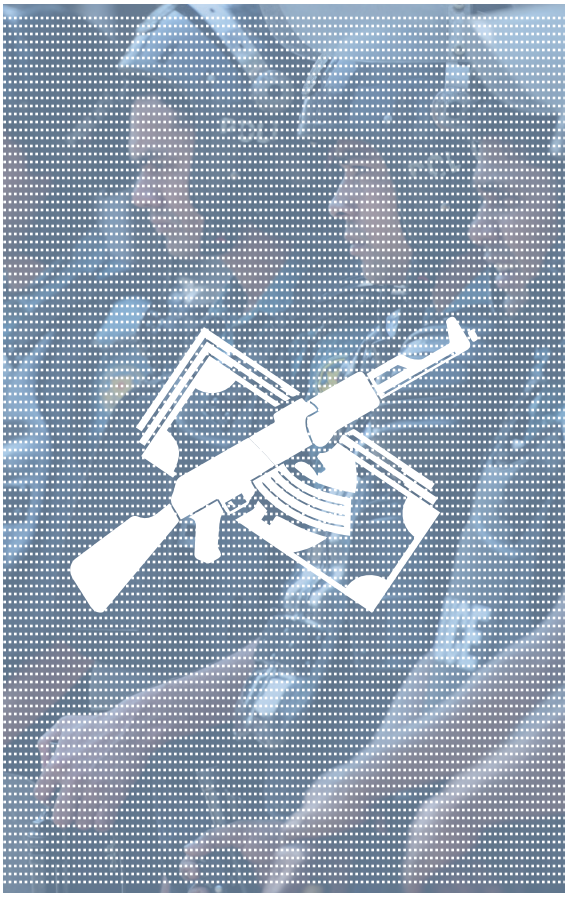

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ফিন্যান্সিয়াল একশন টাস্কফোর্সের (এফএটিএফ) কল্যাণেই বাংলাদেশ তার অবস্থান প্রভূত উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। (মিউচুয়াল ইভালুয়েশন রিপোর্ট, অক্টোবর ২০১৬) প্রকৃতপক্ষে যে ১০টি দেশ সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে বাংলাদেশ তাদের একটি। বাকি ৯টি দেশ হলো: চীন, ইসরায়েল, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, লুক্সেমবুর্গ, লাটভিয়া, গ্রিস এবং সুদান। এফএটিএফ প্রতিবেদন অনুসারে ২০০৯ সালের শেষ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং এএমএল/সিটিএফের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এএমএল/সিটিএফ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বিনিয়োগে এবং আর্থিক শাখায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখিয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে এশিয়া/প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিংয়ের (এপিজি) ৪০টি সুপারিশের সবকটিই বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে ছয়টি বিভাগে পূর্ণ প্রতিপালনকারী, ২২টি বিভাগে প্রায় পূর্ণ প্রতিপালনকারী এবং ১২টি বিভাগে অর্ধ প্রতিপালনকারীর স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৬ সালের ৭ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত অত্র অঞ্চলের ওয়াচডগ এপিজির ১৯তম সাধারণ সভায়ও বাংলাদেশ ইতিবাচক স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশ জঙ্গিবাদে অর্থায়ন এবং মানি লন্ডারিংয়ের ঝুঁকিমুক্ত দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সর্বশেষ এপিজি রিপোর্টে দেখা গেছে তিনটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রেটিং বেশ ভালো, চারটি ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো আর চারটি ক্ষেত্রে তেমন ভালো নয়। এখানে বাংলাদেশের অবস্থান শ্রীলংকার চেয়ে এগিয়ে। কোন উপসূচকেই বাংলাদেশকে নন-কমপ্লায়েন্ট বা অপ্রতিপালনকারী সাব্যস্ত করা যায়নি।

৪ জঙ্গিবাদ দমন

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা

জঙ্গিবাদ ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধ এবং নির্মূল কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রধান করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট 'ন্যাশনাল কমিটি অন মিলিট্যান্সি রেজিসট্যান্স অ্যান্ড প্রিভেনশন' গঠন করেছে বাংলাদেশ সরকার। একইভাবে জঙ্গিবাদ ও সহিংস চরমপন্থা বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৮ সদস্যবিশিষ্ট 'ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেশন' গঠন করেছে সরকার।

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জঙ্গিবাদ ও সহিংস চরমপন্থা মোকাবেলায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬০০ পুলিশ সদস্যের একটি বিশেষ ইউনিট গঠন করেছে বাংলাদেশ। জঙ্গিবাদ, সাইবার ক্রাইম, জঙ্গিবাদের অর্থায়ন ও মোবাইল ব্যাংকিং সংক্রান্ত অপরাধ বন্ধ করার জন্য 'কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম' ইউনিট গঠন করা হয়েছে। পুলিশের একজন উপ-মহাপরিদর্শককে প্রধান করে স্পেশাল ওয়েপনস অ্যান্ড ট্যাক্টিকস (সোয়াট), বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এবং ডগ স্কোয়াড থেকে লোক নিয়ে এই ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এই ইউনিটের কাজ দেশে এবং বিদেশে জঙ্গিদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের কাজকর্মের উপর নজরদারি করা ও তাদের আইনের আওতায় আনা।

আইনকানুন ও নীতি

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মতো জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করার জন্য সন্ত্রাসবিরোধী আইন করা হয়। জাতিসংঘের একশন প্ল্যান অন কাউন্টার টেররিজম স্ট্রাটেজি সহ অন্যান্য প্রস্তাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই সন্ত্রাসবিরোধী আইনটি পরে দু'বার সংশোধন করা হয়েছে। শেষ সংশোধনী সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন ২০১৩-তে আদালত যাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও, স্থিরচিত্র, অডিও ক্লিপ ইত্যাদি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এমন বিধান রাখা হয়েছে। সংশোধিত আইনে অপরাধের মাত্রাভেদে জঙ্গিবাদ ও নাশকতামূলক কার্যক্রমের

জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ও কঠোর আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে। এই আইনের মধ্যে এমন কিছু কৌশল রয়েছে যেগুলো দিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব (ইউএনএসসিআর) ২১৭৮ বাস্তবায়ন করা যায়। ইউএনএসসিআর ২১৭৮-এর বলে কোনো দেশ সে দেশের বাইরের সন্ত্রাসী তৎপরতার হুমকি মোকাবেলায়ও ব্যবস্থা নিতে পারে। ২০১১ সালে সরকার একটি 'ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম স্ট্রাটেজি' তৈরি করেছে। একই বছরের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ 'পালেরমো কনভেনশন এগেইনস্ট ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইমে' সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

জঙ্গিবাদে অর্থায়ন রোধে আইনের ক্ষেত্রেও সংস্কার শুরু হয়েছে। ২০১২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন করে সরকার। জঙ্গিবাদের অর্থায়ন ও মানি লন্ডারিং বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখে আইন পাশ করার ঘটনা বাংলাদেশে এই প্রথম। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট জঙ্গিবাদের অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ পাঁচটি চরমপন্থী সংগঠন - জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি-বি), হিযবুত তাহরীর (এইচটি), শাহাদাত আল হিকমা ও আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ টিমকে (এবিটি) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসব দেশীয় সংগঠন ছাড়াও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ঘোষিত অন্যান্য দেশের সন্ত্রাসী সংগঠনকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিষয়ক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দ্রুতবিচার আদালত হিসেবে দেশের সাত বিভাগে সাতটি জঙ্গিবাদ বিরোধী বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করছে বাংলাদেশ সরকার। ইতোমধ্যে আইন মন্ত্রণালয় সাতটি ট্রাইবুনালে নিয়োগ দেয়ার জন্য সাতজন বিচারকের পদ তৈরি করেছে এবং জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রথম দুটি ট্রাইবুনাল গঠনের প্রস্তুতি চলছে। এই দুই দ্রুতবিচার আদালতে ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ দুজন বিচারক খুব দ্রুত নিয়োগ দেয়া হবে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

২০১২ সালে 'মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স অ্যাক্ট ২০১২' পাশ করেছে বাংলাদেশ। এতে অপরাধকর্মের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের ও বিচার কাজে এক দেশের সাথে আরেক দেশের সহযোগিতার আইনি কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। এই আইনের বলে বাংলাদেশ অন্য

দেশের অনুরোধে অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের সম্পদ এবং অপরাধকর্মে ব্যবহৃত সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা রাখে। মানি লন্ডারিং, জঙ্গিবাদের অর্থায়ন ও অন্যান্য আর্থিক অপরাধ দমন করার জন্য ২০১৩ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ১৩১ সদস্যদেশ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ অর্জন করেছে। এছাড়া ৪১ সদস্য ও বেশকিছু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যবেক্ষক বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত এবং সহযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক সংগঠন এশিয়া/প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিংয়েরও সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের নিজেদের মধ্যকার আঞ্চলিক যোগাযোগ বানচাল করে দেয়ার জন্য ২০১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও ভারতের সাথে একটি কো-অর্ডিনেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (সিবিএমপি) বাস্তবায়ন এবং ভারত-বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্তে জঙ্গিবাদসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমন করার উদ্দেশ্যে যৌথ পাহারা চৌকির সংখ্যা বাড়াতে সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ। সক্ষমতা গড়ে তোলা, তথ্য ভাগাভাগি করা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে বিনিময় যাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যকার জঙ্গিবিরোধী সহযোগিতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১৩ সালের ২২ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বহুমুখী সহযোগিতামূলক কাজ হাতে নিচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের সীমান্ত এবং জল, স্থল ও বিমান বন্দরের নিরাপত্তা অনেক বেড়ে গেছে। জঙ্গি আটক, মামলা দায়ের, এবং সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধ করায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের আরও দক্ষ করে তোলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এবং ইউএস স্পেশাল অপারেশনস কমান্ড প্যাসিফিকের সাথে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) অধীন বিভিন্ন জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রোটোকলের শরিক বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচেষ্টাকে জাতিসংঘের গ্লোবাল কাউন্টার টেররিজম স্ট্রাটেজির চারটি স্তম্ভের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা বিরোধিতার ক্ষেত্রে ২০১৬ সাল থেকে অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং নরওয়ের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ।

৫ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লোকবল সরবরাহকারী দেশ বাংলাদেশ। বিশ্বের নানা প্রান্তে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শান্তিরক্ষা মিশনে ৬,৯৯২ জন পুলিশ, সামরিক বিশেষজ্ঞ ও সৈন্য সরবরাহ করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বশান্তির জন্য বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের অকাতরে প্রাণ দেয়ার দৃষ্টান্তও প্রচুর। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে শুধু সৈন্য ও পুলিশ সরবরাহের দিক দিয়ে দেখলে বাংলাদেশ সম্ভবত বিশ্বব্যাপী চতুর্থ সর্বোচ্চ সরবরাহকারী। বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে জাতিসংঘের বক্তব্য এরকম:

"জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি প্রথম ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের কাজে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করেছিল। সেবার ইরান-ইরাক যুদ্ধবিরতি তদারকির কাজে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের। নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিগত তিন দশক ধরে যেসব দেশে কাজ করেছে তার সবটাতেই অবদান রেখেছে।... বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা নানান রকম কাজ করে থাকে, কেউ নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত, কেউবা নিয়োজিত রাস্তা মেরামত ও নির্মাণের কাজে। কিন্তু সবাই নীল পতাকার নিচে থেকে যে দেশে কাজ করতে গেছে সে দেশের সরকার ও জনগণের স্বার্থেই কাজ করেছে।... শুধুমাত্র বাংলাদেশি মহিলা পুলিশ সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি ইউনিট কাজ করেছে মিনুসতা নামে পরিচিত হাইতির জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে। ২০১৫ সালে শুরু করে ২০১৬ সালের অক্টোবরে মিশনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ইউনিট কাজ করেছে।... জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের বাংলাদেশি সদস্যরা সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআরসি) এবং সুদানের দারফুরের মতো বিশ্বের সবচেয়ে সংঘাতপূর্ণ কিছু অঞ্চলে কাজ করেছে।... কঙ্গোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত গ্রামে গ্রামে টহল দেয় বাংলাদেশি সৈন্যরা।... বাংলাদেশি বাহিনীর সদস্যরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের একটি সম্প্রদায়ের লোকজনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা।... ২০১৭ সালে মনুসকো নামে পরিচিত কঙ্গোর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নাইমা হক এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তামান্না-ই-লুতফী নামেন দুজন যোদ্ধা পাইলট পাঠিয়েছে বাংলাদেশ।... দক্ষিণ সুদানের গাম্বু এবং মাঙ্গালার মধ্যে, জুবা ও বোর এলাকার মধ্যস্থিত ৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা উন্নয়নের কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে জাতিসংঘ মিশনে কর্তব্যপালনরত বাংলাদেশি প্রকৌশলীরা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনেক উপকারে আসবে এই রাস্তা, সহজে পণ্য বাজারে নিয়ে আসতে পারবে তারা।"

সূত্রঃ জাতিসংঘ, ' বাংলাদেশঃ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সেবা আত্মত্যাগের তিন দশক' ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

৬ নিরাপত্তা সম্পর্কে জনগণের উপলব্ধি

সাম্প্রতিক সমস্ত জনমত জরিপেই দেখা গেছে বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সমস্ত নিরাপত্তাজনিত ব্যাপার সরকার যেভাবে সামলাচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট।

২০১৮ সালের মে মাসে চালানো ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) জনমত জরিপে দেখা গেছে ৬৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশের বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয় বেশ ভালো, না হয় মোটামুটি ভালো। গত কয়েক বছর ধরে এই বিষয়টা বারবারই উঠে আসছে। ৪৫ শতাংশ উত্তরদানকারী মনে করেন সামনের দিনগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে।

২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে চালানো ওয়াশিংটনভিত্তিক ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সরকারের জঙ্গিদমন প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট। এই জরিপ মোতাবেক ৭৭ শতাংশ বাংলাদেশি মনে করেন চরমপন্থী হামলা মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ সরকার হয় ভালো অথবা অসাধারণ কাজ করছে। একই জরিপে আরও দেখা গেছে ৭২ শতাংশ বাংলাদেশি মনে করেন, দেশের মানুষকে নিরাপত্তার বোধ দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যেভাবে কাজ করছে তা হয় ভালো অথবা অসাধারণ।

জরিপে আরও দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থাও অনেক বেশি, যেমন র‍্যাবের প্রতি আস্থাশীল ৮৭ শতাংশ মানুষ, পুলিশের প্রতি আস্থাশীল ৭৬ শতাংশ মানুষ। ২০১৭ সালের প্রথম পক্ষে 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকার উদ্যোগে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আরডিসি) কর্তৃক চালানো অপর এক জনমত জরিপেও একই ধরনের আশাবাদ এবং সন্তুষ্টি উঠে এসেছে। সে জরিপ অনুযায়ী ৬৩ শতাংশ উত্তরদানকারী মনে করেন তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বেড়েছে, তবে ১৬.৯ শতাংশ মনে করেন কোনো নিরাপত্তাই বাড়েনি। এছাড়া, ২০ শতাংশ উত্তরদানকারী মনে করেন পরিবারের নিরাপত্তা আগে যেরকম ছিল এখনও সেরকমই আছে।

গ্লোবাল পিস ইনডেক্স (জিপিআই) বা বিশ্বশান্তি সূচক ২০১৬ অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় ভুটান ও নেপালের পরে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। সার্বিক জিপিআই ইনডেক্সে বাংলাদেশ আছে ৮৩তম স্থানে, ভুটান ও নেপাল যথাক্রমে ১৩তম ও ৭৮তম স্থানে। সিডনিভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর ইকনোমি অ্যান্ড পিস (আইইপি) এই সূচক নির্ধারণ করে থাকে। এই ফল প্রকাশ পেয়েছে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে। অঞ্চল হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান অপরিবর্তিত, ৯টি অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার স্থান ৮ম। ২০১৬ সালের জিপিআই অনুসারে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছে আইসল্যান্ড।

বাংলাদেশ: শান্তি ও নিরাপত্তা

Published by Centre for Research and Information(CRI), December 2018

H 2, R 11(New), 32(Old), Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka- 1209
Email: info@cri.org.bd
www.cri.org.bd

Centre for Research and Information